কসমোপলিটন কুঞ্জবন

● গোলাম কিবরিয়া

কয়েকদিন আগে ছিল অস্ট্রেলিয়া ডে। ওরা এটাকে ফাউন্ডেশন ডে-ও বলে। আগ্রাসনের ও এথনিক ক্লিনজিংয়ের কোমল নেরেটিভ গড়া হয় এই দিনে। এবরিজিনদের হাড় মাটি থেকে আবার তোলা হয়, তাতে সান্ত্বনামূলক মানবিকতার প্রলেপ দেয়া হয় এবং অসম্ভব সুন্দর একটা আতশবাজি দিয়ে দিনটি শেষ হয়। ইউরোপিয়ান তাণ্ডবের কথা, গণহত্যার কথা আড়ালে চলে যায় ধীরে ধীরে, যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সিডনির আয়োজনটা হয় ডার্লিং হারবারে। ডার্লিং হারবার মানে প্রিয়বরেষু বন্দর। বাংলাদেশ হলে হয়তো নাম হতো চিরিরবন্দর কিংবা চিলমারী বন্দর।

বাংলাদেশেরই কিছু ছাত্রের সঙ্গী হয়ে কাজ করতে গিয়েছিলাম একটা আইসক্রিম শপে, শরীর-ঘনিষ্ঠ কাজ। এইদিনের জাতীয়তাবোধের অর্থনৈতিক উপযোগটা লুফে নিতে চাচ্ছেন এক অভিবাসী ব্যবসায়ী, সমাগমের জাতীয়তাবাদী তৃষ্ণা তিনি মেটাবেন আইসক্রিম বিক্রি করে। সেই শপেই পরিচয় হলো আমার মুন্নার সঙ্গে। মুন্নার বাড়ি যশোরের ঝিকরগাছায়, বাকড়া গ্রামে। ২৪ বছরের তরুণ ইংরেজি বলতে পারে না, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় কাজ করতে চলে এসেছে কালাপানি পেরিয়ে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ে, তারপর শরৎচন্দ্রের রামের মতন পাড়া বেড়ানোতে একদিন ছেদ ফেলে দেয় তার পিতা। আমাদের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পিতারা চিরকালই ধুঁকে ধুঁকে মরেন, কেউ কেউ বেশি ধুঁকে দেরিতে মরেন, কেউ কেউ কম ধুঁকে তাড়াতাড়ি মরেন কিন্তু দিনশেষে মরে গিয়ে ঠিকই বেঁচে যান। একটা অর্ধসমাপ্ত ঢালাই শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা বাড়ি তার জাগতিক স্বল্পকৃতিত্ব ও অধিকব্যর্থতা নিয়ে ম্লানমুখে বসে থাকে তাজমহলের মতো। মুন্না আরো নিম্নবর্গের, তাই এই বাস্তবিক দুঃখ-বিলাসও তার তকদিরে ছিল না। সাবালক হওয়ার পরই সে সংসার উদ্ধারের ব্রতে চলে আসে মালয়েশিয়া, দালালের হাত ধরে। ওখানে ৫ বছরের কাজের ফাঁকে সুবর্ণগ্রামের নাম শোনে সে, অস্ট্রেলিয়া। তারপর এক শুভলগ্নে মালয়েশিয়ার জহর বারো থেকে ট্রলারে উঠে পড়ে, নামে ইন্দোনেশিয়ার বোম্বানাতে। ওখানে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে এবং ডিটেনশনে যায়। তারপর একদিন তিনতলা থেকে কম্বল, চাদর ও লুঙ্গি পেঁচিয়ে জানালা দিয়ে নেমে পড়ে তারা নয়জন, সবাই বাঙালি।

এই মাসুদ রানাময় অংশটুকু বলার সময় আমি তার মুখে প্রথমবারের মতো হাসি দেখি, জাতীয়তাবাদী হাসি। তার ভাষায়, তাদের সহবন্দি বর্মাইয়ারা (রোহিঙ্গারা) নাকি সাহস করতে পারেনি, বাঙালিরা পেরেছে। তার এই কীর্তি সম্ভবত তার জীবনের একমাত্র ফেয়ারি টেইল, এইখানে সে লড়াইয়ের রসদ পায়। এই কৃতিত্ব আমাকে মনে করিয়ে দেয় তার জন্মভূমির কথা। কী মর্মান্তিক কৃতিত্ব, পলায়নের কৃতিত্ব! দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ যেন একটা গোলকধাঁধার মতো, সে পলাতক ও নাছোড়বান্দা পলাতক। কিন্তু তারপরেও সে বার্মিজদের হারানোর যৌথগল্পের গল্প করে। দরিদ্র জাতীয়তাবাদ, দরিদ্রের জাতীয়তাবাদ, পরাজিতের জাতীয়তাবাদ!!

কয়েক বছর আগে এক যুবক উড়োজাহাজের ডানাকে সারসের ডানা ভেবে উড়তে চেয়েছিল ইকারুসের মতো, লাশ পাওয়া গেল তার। কালাহারি সাহারা কালাপানি পেরিয়ে প্রচুর বাঙালি ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে, গ্রিসে, সাইপ্রাসে, ইতালিতে। চাঁদ সওদাগরের দেশের মানুষেরা সওদা করতে এখন যায় না, নিজেরাই সদাই হয়ে যায়। তাদের শরীর কিনে নেয় দুনিয়া। তার এই নাছোড়বান্দা বেঁচে থাকার অ্যানিম্যাল ইন্সটিঙ্কট তাকে মরতে দেয় না। কারণ সে জানে মরে গেলে জাতিসংঘও তাকে নেবে না কোনোদিন। তার নিজের দেশ তাকে থাকতে দেয় না, বিদেশ তাকে ঢুকতে দেয় না। মিসকিন দেশের মিসকিনদের জায়গা নেই কোথাও। অস্ট্রেলিয়া আসার গল্পটা আমার শোনা হয় না আর, আতশবাজি শুরু হয়ে যায় তখন। চাঁদ সওদাগরের উত্তরপুরুষের দিকে আমি তাকিয়ে থাকি, দেখি জিডিপি, জয় বাংলা ও জিন্দাবাদের লাশ থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, ক্রমাগত। প্রাণপণে আমার ক্লাস-কনশাস দেশপ্রেমের লোবান ঢেলে আমি আটকে রাখি সেই গন্ধ। পারি না। ■

আমাদের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পিতারা চিরকালই ধুঁকে ধুঁকে মরেন, কেউ কেউ বেশি ধুঁকে দেরিতে মরেন, কেউ কেউ কম ধুঁকে তাড়াতাড়ি মরেন কিন্তু দিনশেষে মরে গিয়ে ঠিকই বেঁচে যান। একটা অর্ধসমাপ্ত ঢালাই শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা বাড়ি তার জাগতিক স্বল্পকৃতিত্ব ও অধিকব্যর্থতা নিয়ে ম্লানমুখে বসে থাকে তাজমহলের মতো